পরনির্ভরতা অতিক্রম করতে হলে প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে সর্বত্র

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব জিনিসপত্র ব্যবহার করি তার অরিজিন কোথায়? সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বস্তু হাতের স্মার্টফোন বিদেশে তৈরি। বাসার ড্রয়িং রুমে বসে যে টেলিভিশন দেখি তার উৎপাদনও এদেশে হয়নি। মোবাইল ফোনের যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নেট ব্রাউজিং করছি বা কথা বলছি তার সাপোর্টও কিন্তু অন্য কোনো দেশ দিচ্ছে। অফিসে বা বাসায় বসে কম্পিউটার ব্যবহার করে কোনো কাজ করছি? এর সবই বিদেশি প্রযুক্তি এবং বিদেশে তৈরি। হাতের কলম, কাগজ, চোখের চশমা, পরনের কাপড়, হাতঘড়ি সবই বাইরের কোনো দেশে তৈরি অথবা বিদেশি কোনো প্রযুক্তিতে এদেশে তৈরি। প্রতিদিন ব্যবহৃত সকল প্রসাধনী বিদেশ থেকে আমদানি করা অথবা বিদেশি প্রযুক্তিতে এদেশে তৈরি। এর মধ্যে কতিপয় সামগ্রী আবার বহুজাতিক কোম্পানি তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে, কাচামাল আমদানি করে দেশের মাটিতেই প্রস্তুত করছে। খাবার টেবিলে বসে থালা-বাসন, চামচ, কাপ পিরিচ যা কিছু ব্যবহার করছি তার সবই বিদেশে তৈরি অথবা বিদেশি প্রযুক্তিতে এদেশে তৈরি। এসব বস্তু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ব্যবসা কোনো না কোনো বিদেশি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে।

দেশীয় পণ্য হিসেবে সর্বাধিক প্রচারিত কয়েকটি ইলেকট্রিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ক্যারিশমা হলো বিদেশ থেকে খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে এনে দেশের ফ্যাক্টরিতে এসম্বল করা। দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প গার্মেন্টস কারখানা গড়ে উঠেছে এদেশের শ্রমশক্তিকে পুঁজি করে। এক্ষেত্রে কাপড়, কাপড় তৈরির সুতা, রং, সেলাই করার মেশিন, কেমিক্যাল, অ্যাকসেসরিজ সকল কিছুই আসে চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। এসব ব্যবহার করে উৎপাদিত কাপড় কাটা ও সেলাইয়ের পর আবার রপ্তানি করা হয় ইউরোপ আমেরিকায় বিভিন্ন দেশে। আমরা শুধু সস্তা শ্রমিকের মাধ্যমে কাপড় কাটা, রং করা ও সেলাইয়ের কাজটা করি। বিনিময়ে যে মজুরি আমরা পাই তা দিয়েই মূলত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সর্বাধিক জোগান আসে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে ইদানিং গাজর, টমেটোর মতো বিভিন্ন সবজি পর্যন্ত আমদানি করতে হয়। পিয়াজ, রসুন, আদা, জিরা, কাঁচামরিচ, চাল, ডাল, গম ভুট্টা তো আমদানি করতে হয়। এমনকি ঘর ঝাড়ু দেওয়ার ফুলের ঝাড়ুটাও আমদানি করা হয় নেপাল ও ভুটান থেকে। শহরের আনাচে কানাচে, গলির মোড়ে যে চটপটি ফুসকার দোকান তাতেও ব্যবহৃত হয় থাইল্যান্ডের তেঁতুল আর অস্ট্রেলিয়ার এংকর। ইদানিং থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও চায়না থেকে হাওয়াই চপ্পল থেকে আরম্ভ করে উন্নত মানের স্যান্ডেল ও কেডস আমদানি হয় প্রচুর। অবশ্য পাদুকা শিল্পে আমাদের নিজস্ব বলতে কোনো কালেই কিছু ছিল না। এক কথায় বলতে গেলে নিজস্ব পণ্যে সয়ংসম্পূর্ণ হবার মত কোনো সেক্টরই আমাদের নেই। পুরোই আমদানি নির্ভর এক জাতিতে পরিণত হয়েছি আমরা।

এক সময় এদেশের মানুষের গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর গোলাভরা ধান ছিল। সীমিত সম্পদে সন্তুষ্ট স্বচ্ছল সংসার ছিলো দেশবাসীর। সীমিত সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলো আমাদের পূর্বপুরুষ। উন্নত প্রযুক্তি ও জীবনযাপনের আধুনিক সরঞ্জাম তাদের ছিল না, তা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করেনি।সেকালে ঢাকাই মসলিন খ্যাতি অর্জন করেছিলো বিশ্বব্যাপী। এ শিল্প ছিলো একান্তই এদেশের নিজস্ব শিল্প। নিজেদের বাগানে উৎপাদিত উন্নতমানের তুলা থেকে তৈরি হতে সূক্ষ্ম মিহি সুতা, সেই সুতা থেকে দেশীয় কারিগরদের দক্ষ নৈপুণ্যে তৈরি হতো মসলিন শাড়ি। এর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার বিদেশি যন্ত্রপাতি, কাচামাল, প্রযুক্তি বা শ্রমিকের প্রয়োজন ছিলনা। নিজস্ব প্রযুক্তি ও স্থানীয় কাচামালের উপর নির্ভরশীল এ শিল্পের দ্বারা বাঙালি বিশ্বজুড়ে সুনাম অর্জন করেছিলো। সমসাময়িক বিশ্বে এর অনুরুপ কোনো শিল্প কোথাও ছিলনা। সেসময় অর্থনৈতিকভাবে খুব সমৃদ্ধ না হলেও দেশের মানুষ মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। তার চেয়ে বড়ো কথা তারা নিজস্ব সম্পদে সন্তুষ্ট ছিল। এক অর্থে দেশ নিজস্ব সম্পদে মোটামুটি সয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কালক্রমে বিদেশি শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে এদেশবাসি ক্রমান্বয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকল। তায় দুইশো বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে এদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ইউরোপে পাচার হয়ে যায়। শাসকগোষ্ঠীর নানাবিধ দমন-পীড়ন ও চক্রান্তের ফলে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হতে থাকে। নিজস্ব উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ব্যাপকভাবে। এর ফলে দারিদ্র্য এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা আর খারাপ হতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনামল ও পাকিস্তান আমলে এদেশে বেশ কয়েকটি বড়ো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ বৃটিশ শাসনামল পত্তনের পূর্বে এই ভূখণ্ডে কোনো দিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এমন নজির ইতিহাসে নেই।

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী ইতোমধ্যে পার করেছে বাংলাদেশ। এ সময়ের মধ্যে অর্থনীতির আকার বেড়েছে, বিভিন্ন সূচকে উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক শাসন অতিক্রম করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপকভাবে। একইসাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিদেশ নির্ভরতা। বিদেশি কাচামাল কিংবা প্রযুক্তি ছাড়া চলতে পারে এমন কোনো শিল্প দেশে গড়ে ওঠেনি। মানুষের জীবনযাপন উন্নত হলেও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই আমদানি নির্ভর। কলকারখানা করতে হলে এর সকল যন্ত্রপাতি, কাচামাল ও প্রযুক্তি চড়ামূল্যে আমদানি করতে হয় অন্য কোনো দেশ থেকে। ফলে দেশীয় সম্পদের একটা বড়ো অংশ চলে যায় অন্য কোনো দেশে।

অর্থাৎ এদেশের মানুষ নতুন পন্থায় অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে এদেশ থেকে সম্পদ পাচার হতো বিদেশি শাসকদের দ্বারা। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম শেষে দেশ স্বাধীন হলেও বিদেশি ব্যবসায়ী ও বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাব আজও আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে।

শাসন ও শোষণের এই দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে স্বাবলম্বী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। একথা অনস্বীকার্য যে এদেশে সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে। কিন্তু সম্পদের অপ্রতুলতা বা সীমাবদ্ধতা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথে অন্তরায় নয়। এক্ষেত্রে শ্রমসাধ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশ বিকল্প হতে পারে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হলে প্রযুক্তির কোনো বিকল্প নেই।

এদেশের সর্ববৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প তৈরি পোশাক কারখানা, যার তুলা, সুতা, যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় ক্যামিক্যালস সবই বিদেশ থেকে আমদানি করা। আবার এসব কারখানায় উৎপন্ন পোশাকের গন্তব্যস্থলও দেশের ভিতরে নয়। আমদানীকৃত তুলা থেকে সুতা তৈরি, সুতা দিয়ে কাপড় ও সেই কাপড় থেকে পোশাক তৈরির শ্রমিক এদেশের। অনেক ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক কারখানার বিনিয়োগকারীও বিদেশি কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। শুধু শ্রমনির্ভর এই শিল্প এদেশের বর্তমান অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। অন্য অনেক শিল্পকারখানার তুলনায় পোশাকশিল্পে পরিবেশের দূষণ অনেক বেশি। শুধু শ্রমনির্ভর এই শিল্পের বিকাশ দেশের পরিবেশ দূষণের অন্যতম একটি বড়ো কারণ। পোশাকশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ডাইং কারখানার দূষিত পানি ইতোমধ্যে দেশের অনেক নদী, খাল, ডোবাসহ বিভিন্ন জলাশয়ের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। স্পিনিং মিলসহ বিভিন্ন কারখানায় বিপুল পরিমান বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করতে হচ্ছে যা পরোক্ষভাবে বাতাসে কার্বনের পরিমান বৃদ্ধি করছে। পরিবেশের মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কারণে উন্নত বিশ্ব এ শিল্পকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে স্থানান্তর করছে। এছাড়া সস্তা শ্রমের বিকল্প বাজার খুঁজে পেলে এ শিল্প এদেশ থেকে স্থানান্তরিত হতে পারে অন্য কোনো দেশে। সে প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে লক্ষ্যও করা গেছে। এদেশের তুলনায় আফ্রিকায় কয়েকটি দেশে শ্রম আরও সস্তা। তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিদেশি কোম্পানি ইতোমধ্যে সেসব দেশে বিনিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তাছাড়া থাইল্যান্ড ও ভারত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সাথে তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। উপরন্তু ভূ-রাজনৈতিক কারণে আমদানি-রপ্তানিতে এদেশের নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এদেশের তৈরি পোশাক শিল্প অদূর ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পোশাক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে এদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে। গার্মেন্টস শিল্পের মতো এদেশের প্রতিটি শিল্পই পরনির্ভরশীল, অস্থায়ী ও যে কোনো সময় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। দেশের টেকসই অর্থনীতি নিশ্চিত করতে হলে নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও দেশীয় কাচামাল নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে।

সম্প্রতি আমেরিকা-ইসরায়েল কর্তৃক ইরানে হামলায় ইরানের সামরিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছে। দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ইরান তাদের সামরিক সক্ষমতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে যে বিশ্বের একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদেরকে সমীহ করছে। এটা সম্ভব হয়েছে ইরানের নিজস্ব প্রযুক্তির উন্নয়ন, পরনির্ভরতা হ্রাস ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় কারণে। সর্বাগ্রে তাদের দেশপ্রেম ও অক্লান্ত শ্রম তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সম্পদের অপ্রতুলতা কোনো কিছুই তাদেরকে আটকাতে পারেনি। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মাঝেও ইরান নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছে, নিজস্ব মিসাইল উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছে, নিজস্ব ড্রোন, যুদ্ধবিমানসহ সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করেছে। এসবের জন্য আহামরি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সৎ সাহস ও উদ্যোগ।

দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি আন্তরিক হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি দক্ষতার সাথে নিজেদের মেধা ও শ্রমশক্তির ব্যবহার করে তাহলে দেশেই শিল্পবিপ্লব সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের একসাথে কাজ করতে হবে। দেশের অগ্রগতি ও টেকসই উন্নয়নকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। নতুবা আমাদের আজীবন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা রেলপথ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার